অজৈবজনি : জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি

(প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে –৪)

অভিজিৎ রায়

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘স্বতঃজননবাদের মৃত্যু :

‘স্বতঃজননবাদ’কে (Theory of spontaneous generation) হটিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব অহরহই লুই পাস্তুরকে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এটিও সত্য যে, স্বতঃজননের মাধ্যমে প্রাণ যে কখনই উৎপত্তি হতে পারবে না - এমন ধারণায় পাস্তুর নিজে কখনই নিঃসন্দেহ ছিলেন না। পাস্তুর এ নিয়ে একবার এমন মন্তব্যও করেছেন, তার বিশ বছরের ক্লান্তিহীন গবেষণায় কখনও মনে হয় নি যে, এভাবে প্রাণের উদ্ভব একেবারেই অসম্ভব। আসলে পাস্তুর তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষার সাহায্যে যেটা দেখিয়েছিলেন তা হল, জীবাণুমুক্ত নিয়ন্ত্রিত (পাস্তুর প্রদত্ত) পরিবেশে প্রাণ আপনা আপনি জন্ম নেয় না; কিন্তু অন্য পরিবেশে অন্য ভাবে যে কখনই জন্ম নিতে পারবে না - এই কথা কিন্তু পাস্তুরের ফলাফল হলফ করে বলছে না। ব্যাপারটা একটু পরিস্কার করা প্রয়োজন।

চিত্র ৪.১: লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্বতঃজনন নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্টই মতভেদ ছিল। ব্যাপারটির একটা সুরাহা করবার জন্য ফরাসী বিজ্ঞানী পুশে (F. A. Pouchet) একটি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। তিনি খড়ের নির্যাস নিয়ে মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বাতাসে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ পেলেন যে, অণুজীব স্বতঃস্ফুর্তভাবেই খড়ের নির্যাসে জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু ১৮৬০ সালে লুই পাস্তুর (Louis Pasteur, ১৮২২-১৮৯৫) পুশের এই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি ইস্ট এবং চিনির মিশ্রণ একটা পাত্রে ভরে মুক্ত-বাতাসে রেখে দেন।

কিছুক্ষণ পরেই দেখলেন পাত্রের মিশ্রণটি ব্যাকটেরিয়া এবং প্রটোজোয়ায় ভরে গেছে। কিন্তু বাতাসের প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে একই পরীক্ষা পুনরায় করে দেখলেন - এবারে কিন্তু কোন অণুজীব জন্মাচ্ছে না। পাস্তুর ঘোষনা করলেন যে, বাতাসে যদি কোন স্পোর না থাকে, অর্থাৎ বাতাস যদি বিশুদ্ধ থাকে তবে কোন স্বতঃ জনন হয় না।

পুশে এবং পাস্তুর দুজনই ছিলেন সে সময়কার নামকরা বিজ্ঞানী। কিন্তু একজন স্বতঃজননের সমর্থক, আরেকজন বিরোধী। তাঁদের মতভেদ থেকে আসল সত্যটা বের করবার জন্য ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমী একটি কমিশন গঠন করে দু'বিজ্ঞানীকেই নিজেদের মতবাদের পক্ষে যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

দুই বিজ্ঞানীই একমত হলেন যে, উঁচু পর্বতের চূড়ায় বাতাস থাকে তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ এবং জীবাণুমুক্ত। কাজেই সেখানে গিয়ে ওই জীবাণুমুক্ত পরিবশে পরীক্ষা করলে স্বতঃজননের ব্যাপারে আসল সত্য জানা যাবে। তাই করলেন পাস্তুর; ২০টি ফ্লাস্কে খড়ের নির্যাস ভরে সেগুলো সীল করে গাধার পিঠে চাপিয়ে রওয়ানা দিলেন আল্পস পর্বতের মাউন্ট ব্ল্যাঙ্কের চূড়ায়। সেখানে গিয়ে তিনি সীলগালা ভেঙ্গে বাতাস ঢুকতে দিয়ে একটু পরেই আবার সীল করে দিলেন। পরে এগুলোকে নিয়ে নিজের গবেষণাগারে ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল একটি ছাড়া অন্য কোন ফ্লাস্কে জীবাণু নেই। এ থেকে পাস্তুর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ফ্লাস্কে প্রাণের কোন স্বতঃজনন হয় নি।

১৮৬৪ সালের ২২ শে জুন পুশে এবং পাস্তুর উভয়কেই কমিশনের সামনে হাজির হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হল। পাস্তুর আসলেও পুশে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসলেন না। পাস্তুর তার পরীক্ষায় পাওয়া ১৯ টি ফ্লাস্ক কমিশনের সদস্যদের দেখালেন। কোন জীবাণু দেখা গেল না। তখন কমিশনের থেকে সন্দেহ করা হল যে, ফ্লাস্কের ভিতেরে হয়ত অণুজীব জন্মানোর মত পর্যাপ্ত বাতাস নেই, সে জন্যই জীবাণু জন্মাচ্ছে না। পাস্তুর তখন বাধ্য হয়ে একটি ফ্লাস্কের নল ভেঙ্গে বাতাস বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে তাতে বাতাস বা অক্সিজেনের পরিমান স্বাভাবিক মাত্রায়ই আছে। তখন আবার প্রশ্ন তোলা হল, পাস্তুর যে ঈস্টের মিশ্রণ ব্যবহার করছেন তাতে হয়ত অণুজীব বাঁচতে পারে না। এই সন্দেহের জবাব দিতে গিয়ে পাস্তুর আরেকটি ফ্লাস্কের নল ভেঙ্গে তাতে বাতাস ঢুকালেন, তারপর তিনদিন খোলা জায়গায় রেখে দিয়ে দেখালেন যে মিশ্রণটি অণুজীবে ভর্তি হয়ে গেছে। অন্য ফ্লাস্ক গুলোকে অক্ষত রেখে দেওয়া হল। বেশ কয়েক বছর পরও তাতে কোন অণুজীব পাওয়া গেল না। পাস্তুরের সীল করা ফ্লাস্ক ১৪০ বছর পরেও তেমনি অবস্থায় আছে, কোন জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। তার অনেক আগেই অবশ্য প্রমাণিত হয়ে গেছে অণুজীবের স্বতঃজনন হয় না।

ওপারিন-হালডেন তত্ত্ব :

স্বতঃ জনন ভুল প্রমাণিত হওয়ায় একটা জিনিস বোঝা গেল যে, আপনা-আপনি প্রাণের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু এটিকে 'বেদ-বাক্য' হিসেবে বিশ্বাস করলে হবে না, কারণ এটি কোন স্বতঃসিদ্ধ নয়। আসলে সঠিক বাক্যটি হবে, 'পৃথিবীর আজকের দিনের যে পরিবেশ সেই পরিবেশে জড় পদার্থ থেকে প্রাণ আপনা-আপনি তৈরী হতে পারে না'। এবারে ঠিক আছে। কারণ, আজকের দিনের পৃথিবীর ছবি প্রাচীন পৃথিবীর ছবিটা থেকে একেবারেই আলাদা। বিজ্ঞানীরা আজ মনে করেন, ওই আদিম পৃথিবীর বিজারকীয় পরিবেশেই জড় উপাদান থেকে ধীরে ধীরে সময় সাপেক্ষ বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে কোন অজ্ঞেয় কারণে নয়, বরং জানা কিছু রায়ায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই তত্ত্বটিকে বলা হয় জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব (Chemical theory of Origin of Life)। এই তত্ত্বটির কথা আগের অধ্যায়ে খানিকটা বলেছি। তবে পুরো তত্ত্বটি নিয়ে একটু পরেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।

চার্লস ডারউইন এ মতবাদটি মানতেন,* কিন্তু হয়ত গোঁড়া ধর্মবাদীদের ভয়ে মুখ খুলতেন না তেমন। কিন্তু 'ডারউইনের বুলডগ' বলে পরিচিত বিখ্যাত বিজ্ঞানী টিএইচ হাক্সলি আর বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী জন টিন্ডল প্রকাশ্যে সাধারণ জনগণের কাছে জীবনের রাসায়নিক তত্ত্ব প্রচার করে ধীরে ধীরে এটিকে জনপ্রিয় করে তুলেন। তবে জীবনের উৎপত্তির আধুনিক রাসায়নিক তত্ত্বের জন্মদাতা কিন্তু এরা কেউ নন। জন্মদাতা হিসেবে কাউকে গ্রহন করতে হলে করতে হবে রুশ প্রাণরসায়নবিদ ওপারিন (Alexandar I. Oparin) কে। তিনি ১৯২২ সালে 'জীবনের উৎপত্তি' নামে রুশ ভাষায় একটি বই লেখেন। এই বইটিতেই তিনি প্রথম বারের মত এ পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছিল তার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিবর্তনের দুটি পর্বের কথা তিনি বললেন বইয়ে - রাসায়নিক বিবর্তন (chemical evolution), আর জৈব বিবর্তন (organic evolution)। প্রথম পর্বে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে জড় বস্তু থেকে জীবনের উৎপত্তি হয়, পরবর্তী পর্বে ডারউইনের দেখানো পথে জীব থেকে জীবের বিবর্তন ঘটে । ওপারিনের মতে এ দুটি পর্ব আসলে অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। দুটি পর্ব মিলেই হয় সম্পূর্ণ বিবর্তন (complete evolution)।

---

* চার্লস ডারউইনের Origin of Species বা 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটি উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে কি ভাবে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দিলেও প্রাণের উৎস সম্বন্ধে এটি ছিল নিরব। কিন্তু ডারউইনের ব্যক্তিগত আস্থা ছিল 'আদিম বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব পরিবেশে অজৈব পদার্থ হতেই যে জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয়ে প্রাণের উদ্ভব আর বিকাশ ঘটেছে' এই রায়ানিক উৎপত্তি তত্ত্বের উপর । জনসমক্ষে এটি প্রকাশ না করলেও 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটি প্রকাশের ক বছর পরে তার বন্ধু জোসফ হুকারকে লেখা একটি চিঠিতে প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে তার আনুমানের কথা জানিয়ে বলেন, 'একটা ছোট্ট উষ্ম পুকরে (warm little pond) বিভিন্ন ধরণের অ্যামোনিয়া, ফসফরিক লবন, আলো, তাপ, তড়িৎ সব কিছু মিলে মিশে... প্রোটিন যৌগ উৎপন্ন হয়েছে...।' ডারউইন কথিত এই 'ছোট্ট উষ্ম পুকরই' হচ্ছে পরবর্তীতে হালডেন বর্ণিত তথাকথিত 'আদিম স্যুপ' (primordial soup) যা ইউরে এবং মিলার ১৯৫৩ সালে পরীক্ষাগারে সংশ্লেষণ ঘটিয়ে এমিনো এসিড পেয়েছিলেন।

ওপারিনের বইটির বেশ ক'টি রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারমধ্যে ১৯২৭ সালের বর্ধিত সংস্করণটি 'The Origin of Life' নামে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় - ১৯৩৮ সালে। কিন্তু এর মধ্যেই হালডেন (J.B.S Haldane) নামে আরেক বিজ্ঞানী ওপারিনের কাজের কথা কিছু না জেনেই প্রায় একই রকম বক্তব্য সহ আরেকটি বই লিখেছিলেন। দুই বিজ্ঞানীকেই সমান স্বীকৃতি দিতে জীবনের উৎপত্তির রাসায়নিক তত্ত্বটিকে এখন '**ওপারিন-হালডেন তত্ত্ব**' নামেই অভিহিত করা হয়।

ওপারিন আর হালডেন দু'জনেই তাদের লেখায় বললেন, সাড়ে চারশ কোটি বছর আগেকার পৃথিবী কিন্তু কোন দিক দিয়েই আজকের পৃথিবীর মত ছিল না। এ সময় পৃথিবী ছিল প্রচন্ড গরম, অনেকের মতে তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৫০০০-৬০০০ ডিগ্রীর মত। পানি পড়া মাত্রই তা বাষ্প হয়ে উড়ে চলে যেত।

চিত্র ৪.২: জেবি এস হালডেন (বামে) আলেক্সান্দার ওপারিন (ডানে)

তখন সেখানে ছিল না কোন প্রাণ, ছিল না কোন মুক্ত অক্সিজেন। আকাশ আর পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল হাইড্রোজেন(H), হিলিয়াম (He), নাইট্রোজেন (N), মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়ার (NH_3) মত বিষাক্ত গ্যাসে। সাথে ছিল জলীয় বাষ্প আর কিছু খনিজ পদার্থ। পরে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে আর সূর্যের মহাকর্ষের টানে অধিকাংশ প্রাথমিক গ্যাসগুলো উড়ে চলে যায়। অক্সিজেনের পুরোটুকু বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের পরমাণুর সাথে মিলে নানা ধরনের অক্সাইড তৈরী করে। কার্বনও বিভিন্ন ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে তৈরী করে নানা ধরনের মেটাল কার্বাইড। তৈরী হয় ধীরে ধীরে কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, সিলিকন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড আর সামান্য পরিমাণে হাইড্রোজেন, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোফ্লোরিক এসিড ইত্যাদি। বায়ুমন্ডলে তো কোন মুক্ত-অক্সিজেন ছিল না, আর সেই সাথে বায়ুমন্ডলের বাইরে আজকের দিনের মত ওজোনের স্তরও ছিল না। তাই সূর্যের আলোর অতি বেগুনী রশ্মি খুব সহজেই পৃথিবীতে এসে পৌঁছুত। আর এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি, কস্মিক রশ্মি গুলোর বিকিরণ, আর সেই সাথে বৈদ্যুতিক বিকিরণও ছিল আজকের দিনের চেয়ে বহুগুন বেশী। ওপারিন আর হালডেনের মতে এমন একটি প্রাণহীন পরিবেশে একটা সময় এসব গ্যাসের উপর উচ্চশক্তির বিকিরণের প্রভাবে নানা ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হয়। এগুলো পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে আরো জটিল জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে। এগুলো থেকেই পরবর্তীতে ঝিল্লি তৈরী হয়। ঝিল্লিবদ্ধ এসব জৈব পদার্থ বা প্রোটিনয়েড ক্রমে ক্রমে

এনজাইম ধারণ করতে থাকে আর বিপাক ক্রিয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এটি একসময় এর মধ্যকার বংশগতির সংকেত দিয়ে নিজের প্রতিকৃতি তৈরী করতে ও বা পরিব্যক্তি (mutation) ঘটাতে সক্ষম হয়। এভাবেই একটা সময় তৈরী হয় প্রথম আদি ও সরল জীবনের। তবে এ স্তরে জীবন ছিল অকোষীয়; পরে তা থেকে কোষীয় জীবের উদ্ভব হয়। এ তত্ত্বটির মূল নির্যাসটি হল এটি অজৈবজনি (abiogenesis) - অর্থাৎ, অজৈব জড় থেকে জীবের উৎপত্তির নিদর্শক। একই ধরনের অজৈবজনি সংক্রান্ত ধারণা সমন্বিত করে পরবর্তীতে বই লেখেন জে ডি বার্নাল 'The physical basis of life' (১৯৫১) এবং দু'বার নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী হ্যারল্ড ইউরে 'Planets, their origin and Development' (১৯৫২) শিরোনামে। তাঁদের এবং পরবর্তীতে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ক্রমিক অবদানের পরিপ্রেক্ষিতেই জীবনের অজৈবজনি বা রাসায়নিক উৎপত্তির তত্ত্বটি ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওপারিন-হালডেন তত্ত্বের সত্যতা যাচাই:

তত্ত্ব দিলেই তো হবে না, এর পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ চাই। কি ভাবে বোঝা যাবে যে ওপারিন-হালডেন সত্যি কথা বলছেন? ওপারিন-হালডেনের তত্ত্বানুযায়ী,আদিম বিজারকীয় পরিবেশে অনেক সরল অজৈব পদার্থ থেকে আপনা-আপনি নানা ধরনের জটিল জৈব পদার্থ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা পরীক্ষা করে সত্য-মিথ্যা যাচাই করা খুবই কঠিন। কারণ পৃথিবী তো আর আদিম পরিবেশে চুপটি করে বসে নেই। এর পরিবেশ ইতিমধ্যেই বদলে গেছে বিস্তর। এ পরিবর্তিত পরিবেশে তো পরীক্ষা করে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার কোন মানে হয় না। তাহলে দরকার একটা কৃত্রিম পরিবেশের। কোনভাবে যদি এই কৃত্রিম আদিম পরিবেশ তৈরী করে দেখানো যায় যে, পৃথিবীর আদিতে যে সমস্ত গ্যাস প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল এবং তখন যে সমস্ত শক্তি আর বিকিরণ সক্রিয় ছিল, তাদের প্রভাবে অ্যামাইনো এসিড, বিভিন্ন সরল শর্করা, জৈব এসিড আর তার বেসসমূহ তৈরী হতে পারে, তাহলেই জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত অনুকল্পটির পক্ষে জোরালো যুক্তি পাওয়া যাবে।

শিকাগো বিশ্ববিদালয়ের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রসায়নবিদ হ্যারলড সি. ইউরে (Harld C. Urey) তাঁর গ্রাজুয়েট ছাত্র স্টেনলি এল. মিলার (Sanley L. Miller) কে ওপারিনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবন উদ্ভবের অনুকল্পটি সঠিক কিনা যাচাই করে দেখতে বললেন। মিলার ১৯৫৩ সালে একটি বায়ু নিরোধক কাঁচের ফ্লাস্কে আদি পৃথিবীর পরিবেশের একটা নকল দশা তৈরী করেন, অনেকটা প্রদত্ত ছবির মত (চিত্র ৪.৩ ক)। তিনি আগেই পাম্প করে এর ভিতর থেকে বাতাস বের করে নেন। তারপর সংযুক্ত ফ্লাস্কের পানি ফুটিয়ে জলীয় বাষ্প তৈরী করেন। একটি বড় পাঁচ লিটার ফ্লাস্কে হাইড্রোজেন, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবেশ

করান। সেখানে ওই আগের ফুটন্ত জলীয় বাষ্প এসে মিশে যায়। এবার তিনি মিশ্রণে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালু করেন। বিক্রিয়াজাত গ্যাসগুলোকে শীতকের সাহায্যে ঘনীভূত করা হয়, এবং তারপর সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়।

লক্ষ্যনীয় যে, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ২০টি অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে প্রথম পরীক্ষাতেই ৯ টি অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে (১) গ্লাইসিন, (২)এলানি, (৩) আলফা-অ্যামাইনোবুট্যায়িক এসিড, (৪) আলফা- অ্যামাইনোসোবুট্যায়িক এসিড, (৫) বিটা-এলানি, (৬) এস্পারটিক এসিড, (৭) গ্লুটামিক এসিড, (৮) সারকোসিন, এবং (৯) এন-মিথাইল এলানিন। এছাড়াও তৈরী হয় এলডিহাইড ও কিটোন। এই দুটি উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো জাড়িত হয়ে পরে জৈব এসিড তৈরী করতে পারে।

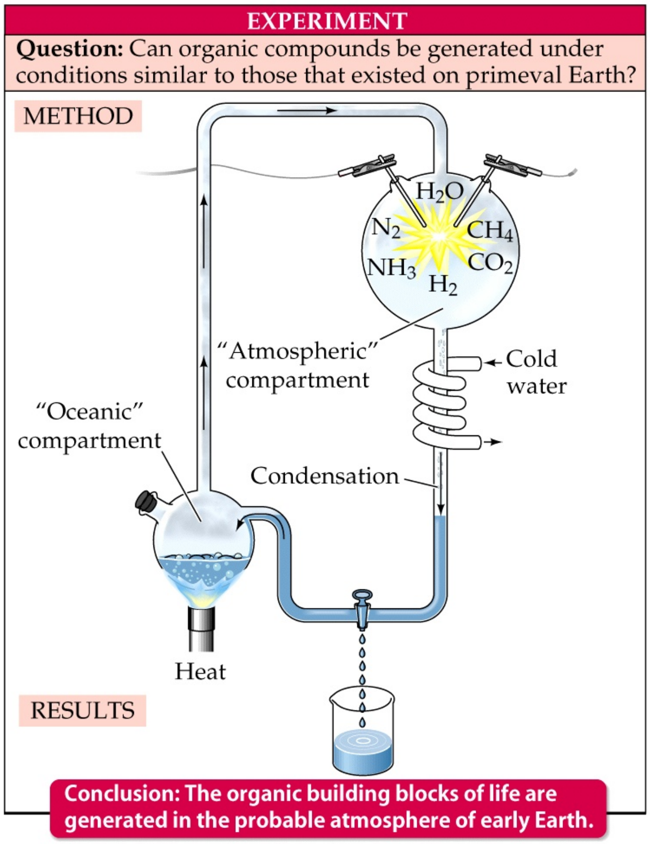

© 2001 Sinauer Associates, Inc.

AMINO ACID	MURCHISON METEORITE	DISCHARGE EXPERIMENT
GLYCINE	• • • •	• • • •
ALANINE	• • • •	• • • •
α-AMINO-*N*-BUTYRIC ACID	• • •	• • • •
α-AMINOISOBUTYRIC ACID	• • • •	• •
VALINE	• • •	• •
NORVALINE	• • •	• • •
ISOVALINE	• •	• •
PROLINE	• • •	•
PIPECOLIC ACID	•	◖
ASPARTIC ACID	• • •	• • •
GLUTAMIC ACID	• • •	• •
β-ALANINE	• •	• •
β-AMINO-*N*-BUTYRIC ACID	•	•
β-AMINOISOBUTYRIC ACID	•	•
γ-AMINOBUTYRIC ACID	•	• •
SARCOSINE	• •	• • •
N-ETHYLGLYCINE	• •	• • •
N-METHYLALANINE	• •	• •

চিত্র ৪.৩: (ক) মিলার ও ইউরের বিখ্যাত পরীক্ষা : আদিম বিজারকীয় পরিবেশে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে জৈব বস্তু উৎপাদন (খ) মিলার ও ওর্গেল প্রমুখের পরীক্ষায় উৎপন্ন ১৮ টি জৈব এসিড

উৎপন্ন এমিনো এসিড গুলোর মধ্যে প্রাচুর্য আর গুরুত্বের দিক দিয়ে গ্লাইসিন নিঃসন্দেহে থাকবে এক নম্বরে। গ্লাইসিন তৈরী হয় ফরমালডিহাইড, অ্যামোনিয়া আর হাইড্রোজেন সায়ানাইডের সমন্বয়ে। মিলারের পরীক্ষায় গ্লাইসিন কিভাবে তৈরী হয় তা নীচের ছবিতে (চিত্র ৪.৪) দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৪.৪: মিলারের পরীক্ষায় কিভাবে গ্লাইসিন উৎপন্ন হয় তা দেখানো হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে মিলার ও ইউরে (১৯৫৫), মিলার ও ওর্গেল (১৯৭৪), মিলার (১৯৮৭) একই পদ্ধতিতে ২০টির মধ্যে ১৮ টি জৈব এসিড এভাবে তৈরী করেছিলেন। তাদের পরীক্ষাই সর্বপ্রথম প্রমাণ করে ওপারিনের অনুকল্প সঠিক; অর্থাৎ, আদিম বিজারকিয় পরিবেশে সত্যই অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের উন্মেষ ঘটেছিল। এ আবিষ্কারের জন্য ইউরে (দ্বিতীয়বার) এবং মিলার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

চিত্র ৪.৫ গবেষণাগারে গবেষণারত স্ট্যানলি এল. মিলার (১৯৫৩ সালে তোলা ছবি)

মিলার-ইউরের কাজের কথা প্রচারিত হবার পর পরই সারা দুনিয়া জুড়ে এ ধরনের কাজের হিড়িক পড়ে যায় একেবারে। অনেকেই নানা রকম দ্রব্য মিশিয়ে বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব বস্তু থেকে জৈব বস্তু পাওয়া যায় কিনা দেখতে শুরু করেন। এর মধ্যে পাবলোবস্কায়া ও পেসিসিস্কি (১৯৫৯), ফিলিপ এবেলসন (১৯৫৭), অরো (১৯৬৩), গ্রাসেনবেখার ও নাইট (১৯৬৫), ডোজ ও রাজেউস্কি (১৯৫৭), হারাডা ও ফক্স (১৯৬৯), গ্রথ ও ওয়েনসেফ (১৯৫৯) প্রমুখের পরীক্ষাগুলো উল্লেখযোগ্য। সবাই কিন্তু মিলার-ইউরের মতই ফলাফল পেয়েছিলেন। আর এখন তো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্রাজুয়েট রসায়ন কোর্সেই ছাত্ররা সাফল্যের সাথে মিলার-ইউরের বিখ্যাত পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

শুধু ল্যাবরেটরীর পরীক্ষাগুলোই যে ওপারিন হাইডেল তত্ত্বের একমাত্র প্রমাণ তা কিন্তু নয়। জ্যোতির্বিদ্যা আর ভুতত্ত্ববিদ্যার বহু সাক্ষ্যই এখন এই তত্ত্বের অনুকূলে। মহাকাশের অনেক তারা, ধুলি মেঘ, মহাশূন্য ও আবহাওয়ামন্ডলে অজৈব পদার্থের অণু থেকে জৈব মনোমার (Organic monomers) গঠনের বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ইউরোপীয় মহাকাশ এজেন্সির গিয়োটো মহাশূন্যযান (Giotto spacecraft) ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতুর অভ্যন্তরে চিনি, অ্যালডিহাইড, অ্যালকোহল, এবং এসিডের সমন্বয়ে গঠিত ফরমালডিহাইডের পলিমারের সন্ধান পায়। আবার আকাশ থেকে পড়া অনেক উল্কাপিন্ডেই সময় সময় নানা ধরনের জটিল জৈব যৌগের সন্ধান পাওয়া যায়। চাঁদ থেকে নিয়ে আসা শিলাখন্ডেও খুব সামান্য পরিমানে হলেও ছয়টি পরিচিত সাধারণ এমিনো এসিডের খোঁজ পাওয়া গেছে। এমনকি এই পৃথিবী পৃষ্ঠেই দেখা গেছে নির্বাত প্রক্রিয়ায় (abiotically) আগ্নেয়গিরির গ্যাসের মধ্যকার ধাতব কার্বাইড আর উত্তপ্ত গলিত লাভা পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোকার্বন তৈরী করছে।

উপরের উদাহরণগুলোর সবগুলোই আদিম পরিবেশে অজৈব পদার্থ থেকে জৈবপদার্থের উদ্ভবের সম্ভাবনাটিকে অত্যন্ত শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রসায়ান চর্চার প্রথম দিকে মানুষের ধারণা ছিল জৈব পদার্থ এবং অজৈব পদার্থ এক্কেবারেই আলাদা দু'টি জিনিস - এদের বৈশিষ্ট্য একদম আলাদা। তারা ভাবতেন জৈব পদার্থ এক অর্থে অনন্য; কারণ জৈব পদার্থের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনদায়ী শক্তি (life force)[†] যা কোন অজৈব পদার্থে নেই। জীবদেহ গঠিত হয় জৈব পদার্থ দিয়ে, তাই এতে রয়েছে প্রাণশক্তির স্ফুরণ; আর অন্যদিকে জড় জগৎ তৈরী হয়েছে অজৈব পদার্থ দিয়ে - তাই তারা প্রাণহীন ও নিথর। জৈব পদার্থের আনন্যতার ধারণাটি মানুষের মনে এতটাই স্থায়ী আসন গেড়ে গিয়েছিল, এর ভুত এখনও আমাদের কাঁধ থেকে নামে নি। এখনও আমাদের পাঠ্য বইগুলোতে 'জৈব রসায়ন' আর 'অজৈব রসায়ন' - আলাদা দু' ভাগে ভাগ করে ছাত্রদের রসায়ন পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু এই সজ্জাত ধারণাটি হঠাৎ ধাক্কা খেল ১৮২০ সালে এসে যখন বিজ্ঞানী ভোয়েলার (Wöhler) তাপ প্রয়োগে অজৈব এমোনিয়াম সায়ানেট থেকে ইউরিয়া নামক জৈব পদার্থ উৎপন্ন করলেন:

$$NH_4.CNO \rightarrow CO(NH_2)_2$$

(এমোনিয়াম সায়ানেট) (ইউরিয়া)

[†] ভ্রমাত্মক life force বা জীবনদায়ীশক্তি নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ভাবে কৃত্রিম উপায়ে ইউরিয়া আবিস্কার করে ভোয়েলার তার শিক্ষক বার্জিলিয়াসকে চিঠি লিখে জানান : 'প্রাণীর বৃক্ক ছাড়াই আমি ইউরিয়া তৈরী করতে সক্ষম হয়েছি।' এরপর আরেক বিজ্ঞানী কোলবি (Kolbe) অজৈব মৌল থেকে অ্যাসিটিক এসিড তৈরী করতে সক্ষম হন। এই সমস্ত আবিস্কারের ফলে জৈব- আজৈবের মাত্রাগত পার্থক্যটুকু ঘুঁচে গেল। যারা জৈবপদার্থকে প্রথম থেকেই 'অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ' একটা কিছু বলে ভেবে নিয়েছিলেন, মনে করেছিলেন জীবনশক্তির (life force) সাহায্য ছাড়া কখনো জৈব পদার্থ তৈরী করা সম্ভব নয়, তাদের বিশ্বাস কিন্তু টলে গেল। এখন তো বিজ্ঞানীরা রসায়নগারে শত শত জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন যে, আমাদের দেহের কার্বন অণুর সাথে ওই মালবাহী ট্রাকটির সায়লেন্সার পাইপের মধ্যে দিয়ে বেরুনো ময়লা কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের ভিতর লুকিয়ে থাকা কার্বন অণুর আসলে কোনই পার্থক্য নেই। কোন জাদুকরের কেরামতিতে অজৈব পদার্থের প্রাণহীন কদাকার কার্বন অণুগুলো জৈব পদার্থে গিয়ে 'সজীব' হয়ে উঠছে না; কোন 'অলৌকিক' জীবনদায়ী শক্তি উষর, বন্ধ্যা কার্বন অণুগুলোকে বদলে দিয়ে (জৈব পদার্থের ভিতর) এগুলোকে প্রাণে প্রাণে পুষ্পিত করে তুলে না। শুধু কার্বন নয়- সেই সাথে হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O) এবং নাইট্রোজেন (N), যেগুলোকে একসাথে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে CHON নামে চিনেছি সেগুলোও কিন্তু অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থে আসার জন্য কোন বিশেষ 'ওহী প্রাপ্ত' হয় না। এদের চেহারা আর বৈশিষ্ট্য কিন্তু একই রকমই থেকে যায়। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জৈব যৌগের উদ্ভব কোন রহস্যময় কারণে নয়, বরং তারা মনে করেন, সুদূর অতীতে নানারকম প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেই অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিলো, যা ১৯৫৩ সালে ইউরে-মিলারের পরীক্ষায় অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, সে সব আদিম জৈব উপাদান থেকেই কালের পরিক্রমায় গড়ে উঠেছিল প্রথম জীব। আগামী অধ্যায়ে জীবনের উৎপত্তির পেছনে রাসায়নিক বিবর্তনের ধাপগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে ।

পুনর্লিখন : ১৯ আগাষ্ট, ২০০৬

{চতুর্থ অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...